Sullah
13/8/91

লোকপ্রশাসন সাময়িকী

সম্পাদনা—পরিষদঃ

মুহম্মদ আব্দুস সালাম
আমিনুল ইসলাম ভূঁইয়া
ডঃ মোহাম্মদ তারেক
সৈয়দ নকীব মুসলীম
কংকা জামিল খান

সম্পাদকঃ

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন

সহযোগী সম্পাদকঃ

মোঃ ইমামুল হক

তৃতীয় সংখ্যা আগষ্ট ১৯৯১ শ্রাবণ ১৩৯৮

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
৩য়সংখ্যা
আগষ্ট ১৯৯১, শ্রাবণ ১৩৯৮

সূচীপত্র

গণতন্ত্র, আমলাতন্ত্র ও সংবিধান ৫
ডঃ মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান

বাংলাদেশে ভূমি আইন ও ভূমি ব্যবস্থাপনার বিবর্তন ১৩
মোহাম্মদ সফিউর রহমান

প্রযুক্তি হস্তান্তরঃ একটি তাত্ত্বিক কাঠামো ৩৭
ডঃ মোহাম্মদ তারেক

বাংলাদেশে মূল্য সংযোজন কর প্রবর্তন ঃ
প্রাসঙ্গিক ভাবনা ৪৭
নাসিরউদ্দীন আহমেদ

জাতীয় অর্থনীতির দীর্ঘ মেয়াদী প্রেক্ষিত ৫৫
এস, এম, আলী আব্বাস

বাংলাদেশের উন্নয়নে পরিবহণ খাতের ভূমিকা ঃ
একটি আলোচনা ৬৫
হেলাল উদ্দিন আহমেদ

চতুর্দশ বিশেষ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম মূল্যায়ন ৭৩
গৌর সুন্দর বনিক

গণতন্ত্র, আমলাতন্ত্র ও সংবিধান

ডঃ মোহাম্মাদ আনিসুজ্জামান

অনেকদিন এক ব্যক্তির শাসনের ফলে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের ভবিষ্যত সম্পর্কে কেউ কেউ বেশ চিন্তিত হয়েছিলেন। সাম্প্রতিককালে এক ব্যক্তি শাসনের পতনের পর গণতন্ত্র উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে। অন্তবর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে মোটামুটিভাবে অবাধ নির্বাচনে সব দলই তাঁদের বক্তব্য উপস্থিত করতে পেরেছেন। সেই সব বক্তব্য বিচার করে সাধারণ ভোটার তাঁদের ভোট দিয়েছেন। একটি নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় এসেছেন। সংসদে খোলাখুলি আলোচনা হচ্ছে। দু'একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সরকারী পক্ষ বিরোধীদলগুলোর সঙ্গে পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছেন। এসব দেখে গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা সাধারণ মানুষের মধ্যে বৃদ্ধি পেতে পারে। তবে এটুকুই যথেষ্ট নয়। গণতন্ত্র একটি মূল্যবোধ যা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র–সর্বস্তরে প্রযোজ্য না হলে এটি কেতাবী বুদ্ধি হিসেবেই থেকে যায়। এর বাস্তবায়ন ও পরিচর্য্যা একটি জীবনব্যাপী সাধনা। বাস্তব জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই হয়ত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও এর ব্যবহার সীমিত অথবা অনুপস্থিত। তথাপি একে যত্নের সঙ্গে লালন করতে হবে এই আশায় যে এর অনুশীলন পরিণামে সমাজ, রাষ্ট্র ও সরকারের জন্য কল্যাণকর হবে। Democracy is never complete, it ever grows into being –এ, ডি, লিন্ডসের কথাটি এখানে স্মর্তব্য। [১]

আমলাতন্ত্র হচ্ছে সরকারী কর্মকর্তাদের শাসন যা নীতিগতভাবে গণতান্ত্রিক শক্তির অনুগত কিন্তু কার্যত স্বাধীন। অর্থাৎ জাতীয় পর্যায়ে নির্বাচিত সরকারের প্রধানমন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপ-মন্ত্রী, সংসদ সদস্যবৃন্দ ও স্থানীয়ভাবে নির্বাচিত স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধান ও সদস্যগণ নিজেদের কাজ কারবারে, দলীয় রাজনীতিতে ও অন্যান্যভাবে এত ব্যস্ত থাকেন যে দৈনন্দিন প্রশাসনের খুটি নাটি তাঁরা বুঝতে পারেন না, অথবা বুঝতে চাননা, অথবা সময় দিতে পারেন না। এর ফলে প্রশাসন আমলাতন্ত্রের হাতে এসে পড়ে। এ প্রসঙ্গে জার্মান পন্ডিত ম্যাক্স ওয়েবার বলেন, "In a modern state,

the actual ruler is necessarily and unavoidably the bureaucracy ...."। [২] এবং bureaucracy is a phenomenon with which the exponents of theories of representative government must learn to come to terms. বৃটিশ গণতন্ত্র ও আমলাতন্ত্র সম্পর্কে তিনধরনের বক্তব্য উপস্থিত হয়েছে– (১) গণতন্ত্রের নির্দেশে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করলে কোন সমস্যাই হয় না; (২) আমলাতন্ত্র সম্বন্ধে গণতন্ত্রের তেমন কিছুই করার নাই অর্থাৎ গণতন্ত্র আমলাতন্ত্রকে মানিয়ে চলবে; এবং (৩) সামজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আমলাতন্ত্র কোন সমস্যা নয়। বৃটিশ লেখক সি পি স্নো'র মতে, "The permanent bureaucracy channels the currents that temporary political masters buck at their peril"[৩] গাই পিটার্স (৪) আরো একটু এগিয়ে গেলেন, "Not only are agencies marked by "the ability of the permanent staff essentially to determine the agenda for their presumed political masters". রালফ হিউমেল উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে আমলাতন্ত্র ও সামাজিক লক্ষ্য কিভাবে পরস্পর বিরোধী। (৫) এক কথায়, পছন্দ করুন বা না করুন, আধুনিক প্রশাসন গণতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ থেকে কার্যতঃ মুক্ত। ঘন ঘন রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা, সামরিক শাসন ও নানা অজুহাতে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমুহের নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির ফলে জাতীয়,আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ে প্রশাসন সত্যিকার অর্থে আমলাতন্ত্রের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়ে এসেছে গত দু'শতাব্দী ধরে। গণতান্ত্রিক সরকার অথবা সামরিক সরকার–সকল আমলেই সরকারী ক্ষমতা কার্যকর ভাবে আমলাতন্ত্রের কাছেই থেকে যায়।

দু' একটি উদাহরণ দেয়া যায়। সংবিধানের ১৩৩ ধারা মতে–"এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে সংসদ আইনের দ্বারা প্রজাতন্ত্রের কর্মে কর্মচারীদের নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলী নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন, তবে শর্ত থাকে যে, এ উদ্দেশ্যে আইনের দ্বারা বা বিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত অনুরূপ কর্মচারীদের নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলী নিয়ন্ত্রণ করিয়া বিধিসমুহ প্রণয়নের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকিবে এবং অনুরূপ যে কোন আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে অনুরূপ বিধানসমুহ কার্যকর হইবে" [৬]– বিধানটিতে আমলাতন্ত্রের উপর মৌলিক ক্ষমতা সংসদের হাতেই রয়েছে। অথচ আজ পর্যন্ত সংসদ এ সম্পর্কে কোন আইন রচনা করিতে পারেন নাই। ফলে এ ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে অর্পিত হয়েছে। ১৩৪ ধারা মতে, "এই বিধানের দ্বারা অনুরূপ বিধান না করা হইয়া থাকিলে প্রজাতন্ত্রের কর্মে প্রত্যেক ব্যক্তি রাষ্ট্রপতির সন্তোষানুযায়ী সময়সীমা পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।" লক্ষণীয় আজ প্রায় বিশ বৎসরের মধ্যে সংসদ এ বিষয়ে কোন স্পষ্ট নির্দেশ দিতে পারেন নাই। রাষ্ট্রপতি যেহেতু নিজে সব কিছু করতে পারেন না,আমলাতন্ত্রই কার্যতঃ রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ব্যবহার করেন, ফলে বাংলাদেশে আমলাতন্ত্রই কেবলমাত্র আমলাতন্ত্রের একমাত্র কার্যকর নিয়ন্ত্রক, না সংসদ, না রাষ্ট্রপতি, না মন্ত্রী, কেহই আমলাতন্ত্রের কার্যকর নিয়ন্ত্রক নন। ফলে আমলাতন্ত্র প্রকৃতপক্ষে নিয়ন্ত্রণহীন। সংবিধান সংসদকে এব্যাপারে সর্বক্ষমতা ন্যস্ত করা সত্বেও সংসদ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার উদ্যোগ তেমন নেননি। কালাইয়ের ভাষায় Democracy-if it knows its ways-has nothing

to fear from bureaucracy"[৭,৮,৯] কথাটি বাংলাদেশের মাননীয় সংসদ সদস্যগণ ভেবে দেখতে পারেন।

সংবিধানের ১২৭ ধারা মতে বাংলাদেশের একজন মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক রয়েছেন। তাঁর দায়িত্ব "তিনি প্রজাতন্ত্রের সরকারী হিসাব এবং সকল আদালত, সরকারী কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর সরকারী হিসাব নিরীক্ষা করিবেন ও অনুরূপ হিসাব সম্পর্কে রিপোর্টদান করিবেন"। ১৩২ ধারামতে " প্রজাতন্ত্রের হিসাব সম্পর্কিত মহা-হিসাব নিরীক্ষকের রিপোর্টসমুহ রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হইবে এবং রাষ্ট্রপতি তাহা সংসদে পেশ করিবার ব্যবস্থা করিবেন"। মহাহিসাব নিরীক্ষক উক্ত রিপোর্ট পেশ করার পর রাষ্ট্রপতি সংসদে পাঠান। এখন সংসদের দায়িত্ব এই রিপোর্টে উল্লেখিত ত্রুটিবিচ্যুতি আলোচনা করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। স্বাধীনতার পর প্রথম জাতীয় সংসদে ১৯৭৪ সালে প্রথম সরকারী হিসাব কমিটি গঠিত হয়। উক্ত কমিটি মাত্র ৩টি বৈঠকে মিলিত হন এবং সংসদে কোন প্রতিবেদন পেশ করতে পারেন নাই।[১০] চতুর্থ জাতীয় সংসদ কর্তৃক গঠিত সরকারী হিসাব কমিটি মন্তব্য করেন যে পুর্ববর্তী কমিটি সমুহের অনেক সুপারিশ সম্পর্কে কার্যকর পদক্ষেপ লওয়ার জন্য অডিট বিভাগ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট মনত্রণালয় সমুহে উপর্যুপরি তাগিদ দেওয়া সত্বেও কোন পদক্ষেপ লওয়া হয় নাই।[১০] অতএব দেখা যাচ্ছে যে এই রিপোর্ট যথাযথ কার্যকর হয়না। যতটুকু হয় তার অনুসরণ হয় কি না এবং অপরাধী কর্মকর্তার শাস্তি হয় কি না-জনসাধারণ তা জানতে পারেন না। ফলে আমলাতন্ত্র মোটামুটি স্বাধীনই থেকে যাচ্ছে।

৭৬ (১) ধারামতে "সংসদ সদস্যের মধ্য হইতে সদস্য লইয়া সংসদ সরকারী হিসাব কমিটি নিয়োগ করিবেন"। সরকারী হিসাব কমিটি সরকারী ব্যয় বরাদ্দের বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার বিশ্লেষণ করতে পারেন। তাদের প্রয়োজনীয় ক্ষমতা সংবিধানে দেওয়া আছে কিন্তু এই সব ক্ষমতা ব্যবহৃত হয় কি? মাননীয় সংসদ সদস্যগণই কমিটির সদস্য হিসাবে "সাক্ষীদের হাজিরা বলবৎ করিবার এবং শপথ ঘোষণা ও দলিলপত্র" পরীক্ষা করিবার ক্ষমতা রাখেন। সদস্যগণ কি এই সব ক্ষমতা যথাযথ ব্যবহার করেছেন? করে থাকলে সরকারী হিসাব কমিটি অর্থ মন্ত্রণালয়ের উপর কার্যকর ক্ষমতা খাটাতে পারেন। সরকারী হিসাব কমিটির কার্য্যাবলীর পূর্ণ বিবরণ নিয়মিত ও যথাসময়ে প্রকাশিত হয় না। ফলে জনগণ জানেন না সংসদ বা সংসদ কর্তৃক নিয়োগকৃত সরকারী হিসাব কমিটি কতটুকু কার্যকরী ভুমিকা পালন করছেন।

সংসদে বাজেট অর্থাৎ আয়-ব্যয়ের প্রস্তাব নিয়ে যত বির্তক করেন বা সমালোচনার ঝড় তোলেন, তার দশভাগের একভাগও সরকারী অর্থের ব্যয় কিভাবে হোল, কারা ব্যর্থতার জন্য দায়ী, আগামীতে কি করা উচিত এসব গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ে বিতর্ক করেন না। ৭৭ ধারামতে সংসদ "আইনের দ্বারা ন্যায়পালের পদ প্রতিষ্ঠার বিধান দিয়েছেন। আজ পর্যন্ত এটি করা হয় নাই। অথচ জনগণের অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান ও প্রশাসনিক অনিয়মের সুবিচারের জন্যই এপদের প্রতিষ্ঠা। প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান কিছু

কাজ শুরু করেছিলেন কিন্তু বাস্তবায়ন করতে পারেন নাই। এরপর কোন প্রেসিডেন্ট এব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নেন নাই। ফলে কোন মন্ত্রণালয়, সরকারী কর্মকর্তা সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষের যে কোন কার্য সম্পর্কে সংসদে উপস্থিত হওয়ার কথা ৭৭(৩)। অথচ সংসদ এব্যাপারে নিস্ক্রিয়। এ ধরনের কোন প্রতিষ্ঠান কার্যকর থাকলে হয়ত অনেক অনিয়ম বা প্রশাসনিক অবস্থার দরুন সাধারণ মানুষের হয়রানি হোত না। এ ব্যাপারে সংসদের কি কোনই ভুমিকা থাকবে না?

১৪১ (১) ধারামতে–"সরকারী কর্মকমিশন প্রতি বৎসর মার্চ মাসের প্রথম দিবসে বা তাহার পুর্বে পুর্ববর্তী একত্রিশে ডিসেম্বরে সমাপ্ত এক বৎসর স্বীয় কার্যবলী সম্বন্ধে রিপেটি প্রস্তুত করবেন এবং তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করিবেন" এবং ১৪১ (৩) ধারামতে "যে বৎসর রিপোর্ট পেশ করা হইয়াছে, সেই বৎসর একত্রিশে মার্চের পর অনুষ্ঠিত সংসদের প্রথম বৈঠকে রাষ্ট্রপতি উক্ত রিপোর্ট ও ১৪১ (২) ধারামতে স্মারকলিপি সংসদে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করিবেন"। এই ক্ষমতা সংসদ যথাযথভাবে ব্যবহার করলে সরকারী কর্ম কমিশনের কোন পরামর্শ গৃহীত হয় নাই এবং গৃহীত না হওয়ার কারণ এবং "যে সকল ক্ষেত্রে কমিশনের সহিত সরকারের পরামর্শ করা উচিত ছিল অথচ পরামর্শ করা হয় নাই, সেই সকল ক্ষেত্র এবং পরামর্শ না করিবার কারণ" সম্পর্কে জনসাধারণ অবহিত হতে পারেন এবং তার মাধ্যমে এই সব ক্ষেত্রে সরকারী কর্মকান্ডকে সংসদ অধিকতর নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

তা হলে দেখা যাচ্ছে, সংবিধানে যে সমস্ত রক্ষাকবচ আছে সেগুলো সম্বন্ধে আমরা মোটামুটি উদাসীন। সংসদ যে ক্ষমতা ব্যবহার করে জনগণকে আমলাতান্ত্রিক হয়রানি থেকে রক্ষা করতে পারেন সেই সব সাংবিধানিক ক্ষমতা সংসদ পুরোপুরিভাবে ব্যবহার করেন নাই অথবা করতে আগ্রহী নন। সংসদ.তার অধিকার ও দায়দায়িত্ব সম্বন্ধে যত যত্নবান হবেন, গণতন্ত্র তত দানা বাঁধবে।

আমাদের যে সীমিত সুযোগ সংবিধান দিয়েছে তার যথাযথ ব্যবহার আমরা করছি না কেন? আইন করার সুযোগ আছে, আমরা আইন করছি না কেন?

প্রথম দিকে গণতন্ত্রকে একটি মুল্যবোধ হিসাবে চিহ্নিত করেছি। গণতন্ত্র একটি জীবন ব্যবস্থা। অর্থাৎ পরিবারে, স্কুলে, অফিসে এককথায় সর্বস্তরে গণতান্ত্রিক মুল্যবোধ সক্রিয় থাকতে হবে। তা না হলে হঠাৎ করে গণতন্ত্র সংসদে মূর্ত হয়ে উঠতে পারে না। একটি উদাহরণ দেই। এবারের সংসদীয় নির্বাচনে দল নির্বিশেষে প্রায় প্রতিটি প্রার্থী এভাবে ভোট চেয়েছেনঃ–

(ক) "খালেদা জিয়ার মনোনীত প্রার্থীকে ভোট দিন"।

(খ) "শেখ হাসিনার মনোনীত প্রার্থীকে ভোট দিন"।

(গ) "এরশাদের মনোনীত প্রার্থীকে ভোট দিন"।

অথচ বলা উচিত ছিল যথাক্রমে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের, আওয়ামী লীগের, জাতীয় পার্টির মনোনীত প্রার্থীকে ভোট দিন। অর্থাৎ আমাদের মনে ব্যক্তি দলের চেয়ে বড় বলে স্থান করে নিয়েছে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় এধরনের মানসিকতা বিপদজনক। প্রায় একইভাবে আমলাতন্ত্র প্রেসিডেন্টকে খুশী করার প্রবণতা দেখিয়েছেন। গভর্ণর জেনারেল জিন্নার প্রতি, প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের প্রতি, প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবের প্রতি, প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের প্রতি ও প্রেসিডেন্ট এরশাদের প্রতি এদেশের আমলাতন্ত্র এমন অনুগত্য দেখিয়েছেন যে দেশে আর কেউ আছেন বা আর কোন প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাঁদের কোন দায় দায়িত্ব আছে বলে মনে হয় না। যে কোন বড় অফিসারের অফিসে ঢুকেই প্রথমে চোখে প্রেসিডেন্টের একটি ছবি। এই সব ছবি প্রতীকী হিসাবে একনায়কত্বকে উৎসাহ দেয়, অফিসারের কর্মতৎপরতার জন্য ছবির কি প্রয়োজন?

আর একটি উদাহরণ দিই। ৫৬(১) ধারামতে "প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃত্ব রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত হইবে এবং এই সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তাহা প্রত্যক্ষভাবে অথবা তাঁহা অধীনস্থ কর্মচারীর মাধ্যমে প্রযুক্ত হইবে"। খুব সম্ভবত এই ধারামতেই রাষ্ট্রপতি প্রশাসনের প্রধান। তিনি নিজে প্রশাসন পরিচালনা করবেন অথবা তাঁহার অধিনস্থ কর্মকর্তাদের মাধ্যমে পরিচালনা করবেন। যেহেতু রাষ্ট্রপতি নিজে সরাসরি সবকিছু পরিচালনা করতে পারেন না, তাঁর পক্ষে পরিচালনা করেন আমলাতন্ত্র। সংবিধানের ৫৬(১) ধারামতে আমলাতন্ত্র শুধু রাষ্ট্রপতির "অধীনস্থ", মন্ত্রী বা সংসদের অধীন নন। মন্ত্রী এখানে মুখ্য ভুমিকায় আসেন না। প্রেসিডেন্টগণও একদিকে এ ধরনের ব্যবস্থাই বেশী পছন্দ করেন, অন্যদিক দাবী করেন, "উপনিবেশিক প্রশাসন ব্যবস্থা স্বাধীন দেশে চলতে পারে না", ইত্যাদি। ফলে গণতন্ত্র অর্থাৎ আমলাতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকভাবে তাঁদের কাজের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য–এ ব্যবস্থা দৃঢ়মুল হতে পারছেনা। ঘন ঘন সামরিক শাসনের ফলে প্রেসিডেন্ট ও উঁচু আমলাদের দ্বারাই যুগ্মভাবে দেশ শাসিত হয়েছে, সামরিক শাসনের অবসানেও এর জের থাকে যাচ্ছে।

এদায় দায়িত্ব কারো একার নয়। জনগণ, সরকার, প্রশাসন বিশেষ করে ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ ভুমিকা রয়েছে। তাঁদের কাজে ও ব্যবহারে তাঁরা গণতান্ত্রিক মুল্যবোধের বিকাশ ঘটাতে পারেন। প্রশাসনে শৃঙ্খলার প্রয়োজন। এখন যে প্রশাসক সম্মানিত পরে সেই প্রশাসকই ধিকৃত ও অবনমিত। এক আমলে যে প্রশাসক খুব সুখ্যাতি অর্জন করেছেন, অন্য আমলে তাকে ক্ষমতাহীন করে বিনা কাজে অর্থাৎ অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি (ও এস্‌ডি) করে রাখা হচ্ছে। অথচ বলা হচ্ছে না তাঁর কি অপরাধ? এক আমলে যিনি সকলের সমালোচনা করেছেন, অন্য আমলে তিনি নেতা। সরকারী কর্মকর্তা কর্মরত অবস্থায় কি করে প্রকাশ্যে সরকারের কাজের সমালোচনা করতে পারেন, তাও বোধগম্য নয়। সরকারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধি ১৯৮৫ এবং আচরন বিধি ১৯৭৯ অনুযায়ী তিনি এ ধরনের কাজ করতে পারেন না। একাজ করতে হলে তাঁকে চাকুরী ছেড়ে রাজনীতি করতে হয়। কখনও বিধিসম্মতভাবে সরকার এ সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা করেন, কখনও আবার নমনীয় হন। এসব কর্মকান্ডের ফলে শৃঙ্খলাবোধ দুর্বল হয়ে পড়েছে।

সীমিত আলোচনার প্রেক্ষিতে দেখতে পাই, সংবিধান প্রদত্ত ক্ষমতা সংসদের আছে, অথচ তার যথাযথ ব্যবহার নেই। এতে সংবিধানের মূল উদ্দেশ্য ব্যহত হচ্ছে। গণতান্ত্রিক মুল্যবোধের প্রতিষ্ঠা ও লালনকল্পে বেশ কয়েকটি রক্ষাকবচ আমাদের সংবিধান দিয়েছে যার দ্বারা গণতন্ত্রের বিকাশ, গণতান্ত্রিক মুল্যবোধের লালন এবং ব্যবহারিক প্রয়োগ অর্থাৎ কর্মকর্তাদের প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহির নিশ্চয়তা বিধান হতে পারে। এখন, প্রয়োজন সংবিধানের যথাযথ ব্যবহার। এ ব্যাপারে সংসদের ভুমিকাই মুখ্য বলে আমার মনে হয়।

পরিশেষে বলা যায়, গণতন্ত্রের লালন ঠিকমত হলে আমলাতন্ত্র যথাযথ নিয়ন্ত্রণে থাকবে। আমলাতন্ত্রের কোন কার্যকর বিকল্প আবিষ্কৃত হয় নাই। ফলে সকলদেশেই আমলাতন্ত্র কমবেশী আছে। কিন্তু গণতান্ত্রিক পদ্ধতি সংবিধানিকভাবে যথাযথ ব্যবহৃত হলে চিন্তার কোন কারণ নেই। প্রশাসনিক তত্ত্ববিদগণের কেউ কেউ এ ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। জার্মান পন্ডিত ম্যাক্স ওয়েবার বলেন, গণতন্ত্রকে কিছুটা হার মানতে হবে আমলাতন্ত্রের কাছে–কারণ আমলাতন্ত্র সুদক্ষ আর গণতন্ত্র অদক্ষ। কথাটি আপাতঃ সত্য, তবুও আমার মনে হয়, গণতন্ত্র দক্ষতা অর্জন করতে পারে, যদি গণতন্ত্র সাংবিধানিকভাবে নিজের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন ও দায়িত্ব সম্পর্ক সর্তক হয়। তা না হলে গণতন্ত্রের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা সম্বন্ধে সক্রেটিস ও প্লেটো যে আশংকা ব্যক্ত করেছিলেন[১১], তাই সত্যি হয়ে দেখা দিতে পারে।

পাদটীকা ও তথ্য সংকেত

১। A. D. Lindsay. The Essentials of Democracy. Oxford: Clarendon, 1929.
The Modern Democratic State. New York: Oxford University Press, 1962.

২। M. Albrow. & Bureaucracy. London: Pall Mall, 1990.
Max Weber. The Theory of Social and Economic Organization. A. M Henderson and Talcott Parsons 1947; From Max Weber. Essays in Sociology. H.H. Gerth and C. Wright Mills. New York: Oxford, 1962, Economy and Society.

৩। C. P. Snow. Corridors of Power; Science and Government Harvard Universihy Press, 1960.

৪। Guy Peters. The Politics of Bureaucracy: A Comparative Perspective. 1978

৫। Ralph Hummel. The Bureaucratic Expericnce. New York: St. Martins Press. 1987.

৬। গণপ্রজাতন্ত্রীবাংলাদেশেরসংবিধান (১৯৮৮ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত সংশোধিত)

৭। Michael J. Hill. The Sociology of Public Administration. London: Weidenfelds Nicholson, 1972.
Anthony Downs. Inside Bureaucracy. Boston: Little Brown, 1967.

৮। M. A. Mutalib. Democracy, Bureaucracy and Technocracy. New Delhi: Concept Publishing Co. 1980.

৯। Peter Self. Administrative Theory and Politics. R. White and R. Lippitt. Autocracy and Democracy. New York: Harper & Row, 1960.

১০। বাংলাদেশজাতীয়সংসদ। সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির দ্বিতীয় প্রতিবেদন। ফেব্রুয়ারী, ১৯৯০।

১১। প্রেটোররিপাবলিক। সরদার ফজলুল করিম অনুদিত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮২।

বিঃ দ্রঃ ৭নং পাদটীকায় কার্লাইলের বক্তব্যটি মূলতঃ বৃটিশ গণতন্ত্র সম্পর্কে প্রযোজ্য। বৃটিশ পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র সম্পর্কে তার এই উক্তটি প্রণিধানযোগ্যঃ 'I can see no risk or possibility in England. Democracy is hot enough here. দেখুন Albrow, Bureaucracy (Lonoan: Pall Mall, 1990), পৃঃ ২১। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে পার্লামেন্টারী পদ্ধতি বেশ কয়েক যুগ চালু হওয়ার পরেই শুধু কার্লাইল কথিত 'গণতন্ত্রের উষ্ণতা'র আশা করা যেতে পারে।

বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের

গবেষণা কর্মের তালিকা

১৯৮৬–৮৭ অর্থবছর

১. বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে কর্মজীবন উন্নয়ন কর্মসূচী সম্পর্কে সমীক্ষা
২. সরকারী কর্মকর্তাদের কার্য সম্পাদন সমীক্ষা
৩. উপজেলা প্রশাসনের কতিপয় দিকঃ প্রশিক্ষণ
৪. সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের এবং বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে বিরাজিত সমন্বয় সমস্যা সমীক্ষা
৫. তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কতিপয় দিক
৬. বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে মহিলা
৭. উপজেলা প্রশাসনের কতিপয় দিকঃ সমন্বয়
৮. প্রতিষ্ঠান নির্মাণের উপর ঘটনা সমীক্ষা

১৯৮৭–৮৮ অর্থবছর

১. A Case Study of the Procedures for Adjudication of Grievances of Government Employees.
২. সরকারী দপ্তর সমূহের পরিদর্শন ও অনুসৃত পদ্ধতির নিরীক্ষা
৩. A Study of Constraints and Potentials in Domestic Resources Mobilization.
৪. Education in Bangladesh: A Case Study of Policy Planning in Primary Eduction.
৫. Assessment of Training Needs of Senior Civil Servants.
৬. Assessment of Training Needs of Mid-Level Officers.
৭. বুনিয়াদী পর্যায়ে প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ
৮. ফৌজদারী মামলা নিষ্পত্তিকরণঃ উপজেলা ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতের উপর একটি ঘটনা সমীক্ষা